মঙ্গলকাব্যের ধারায় অন্নদামঙ্গলের বৈশিষ্ট্য

পুরাতন ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং ভাবী যুগোপযোগী ঐতিহ্য সৃজন—অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে এই দুটি বৈশিষ্ট্য আনুভূমিক। অবশ্য ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মধ্যে ফারাক ততটা গুণগত নয়, যতটা মাত্রাগত। ঐতিহ্য রূপান্তরিত হতে হতেই আধুনিকতার মাত্রা পেতে পারে। এমনটাই লক্ষ করা যায় ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে। সাহিত্যে যুগের দাবি সর্বোচ্চে। আর সেই হেতুতেই *অন্নদামঙ্গল*-এর ঐতিহ্যের স্বীকরণ যুগের প্রত্যাশায় আধুনিক হয়ে উঠেছে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেব প্রধানতম লক্ষণ ধর্মমনস্কতা—*অন্নদামঙ্গল*-এর কাহিনীকাঠামোও ধর্মকেন্দ্রিক। কিন্তু ধর্মের নিঃসাব মুখোশটা এখানে অনেকটাই খোয়া গেছে। আর তার বিলুপ্তির মধ্যে দিয়ে ধরা পড়েছে মুখোশের অন্তরালে থাকা বাস্তব জীবন। যার অস্তিত্বের মধ্যে প্রাণের হিল্লোল, অবসন্ন চেতনাব গুমোট পরিবেশে মুক্তির উত্তাল শিহরণ, চিন্তার অবদমিত দশার পরে মননের স্বাধীনতা। ফলে *অন্নদামঙ্গল* কোনো-না-কোনো ভাবে অধ্যাত্মগন্ধী হলেও কখনই তা প্রকট হয়ে ওঠে না। সাহিত্য যে জাতির আত্মপ্রকাশেব প্রধানতম হাতিয়ার, সমাজের, যুগের, মানসিকতার প্রতিফলন যাতে পড়ে, যেখানে নিয়ত চলে জীবন-অন্তঃপুরেব ভাঙাগড়ার কাজ—সেই অতীত ঐতিহ্য বর্তমান অনুষঙ্গ আর ভবিষ্যতের রূপরেখার একটা অপূর্ব মিশ্রণে *অন্নদামঙ্গল* ধর্মীয় হয়েও জাতিব অন্তরাত্মার কাব্য হতে পেরেছে। অন্নদার ভবানন্দের গৃহে গমন অংশ তো বাঙালির স্বপ্ন-বাস্তবের-ই ছবি। আরো একধাপ এগিয়ে বলা যায় *অন্নদামঙ্গল*-এ দেবতার বদলে মানুষ, কিংবা দেবতার মানবায়ন ঘটেছে। এই মানবমুখিনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (individuality ও humanity) আধুনিক যুগের লক্ষণ।

নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অনুরোধে *অন্নদামঙ্গল*কাব্য রচিত হয়েছিল ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে। কাব্যটিব তিন খণ্ডে বিভাজন (ক) অন্নদামঙ্গল অর্থাৎ দেবখণ্ড (খ) কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর অর্থাৎ লৌকিক আখ্যান (গ) অন্নপূর্ণামঙ্গল ব' মানসিংহ অর্থাৎ ঐতিহাসিক কাহিনী। পুরাণ, রোমান্টিক-লোকগাথা আর ইতিহাসেব সহায়তায় প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের ধারায় আবির্ভূত হয়েও *অন্নদামঙ্গল* হয়ে উঠল 'নূতন মঙ্গল'। কাব্যটির তিনটি অংশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, পৃথক মর্যাদার অধিকারী। তবু এই তিনটির মধ্যে কাহিনীর যোগসূত্রগত আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, 'বিদ্যাসুন্দব' অংশ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"গল্পের ভিতর গল্প—ভারতবর্ষের এক নূতন ব্যাপাব। ঠিক যেন চীনে বাক্স—একটার ভিতর একটা তার ভিতর একটা। আমাদের পঞ্চতন্ত্র তাই, হিতোপদেশ তাই, বৃহৎকথা তাই, কথাসরিৎসাগর তাই, মহাভারত তাই, পুরাণগুলিও তাই। বাংলায় আসিয়া বিদ্যাসুন্দরও তাই হইয়া পড়িয়াছে। উপরের বাক্স কালিকামঙ্গল, ভিতরের গল্প বিদ্যাসুন্দর।"—এই মন্তব্য কেবলমাত্র 'বিদ্যাসুন্দর' অংশ সম্বন্ধে নয়, সমগ্র *অন্নদামঙ্গল* কাব্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

তিনখণ্ডে বিভক্ত হলেও ভারতচন্দ্রের সমগ্র কাব্যের নাম *অন্নদামঙ্গল*। অর্থাৎ প্রত্যেকটি খণ্ড-কাহিনীর বিষয়বস্তু যাই হোক—তাদের মূল লক্ষ্য একটি— দেবী অন্নদার মাহাত্ম্য কীর্তন। এই ক্ষীণ সূত্রে সমগ্র কাব্যটি বিধৃত হয়েছে। তবু কাব্যের বিষয়বস্তুর অভিনিবেশপূর্বক মূল্যায়ন এমন ঘোষণা করতেই পারে যে, কবি ভক্তিরসের প্রেরণায় এই কাব্য রচনা

করেননি। কবিকঙ্কণের *চণ্ডীমঙ্গল*-এ ভক্তির যে আন্তরিক সুরটি লক্ষ করা যায়—এই কাব্যে তা বিরল। যদিও এখানে দেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপন আছে, দেবীর কৃপায় নানা অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য কাহিনীর সংঘটন ও প্রদর্শনও আছে, তবু যে নিবিড় ও স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়াবেগ ভক্তিরসের প্রাপ্য—এই কাব্যে তার একান্ত অভাব। কাহিনীব মূল লক্ষ্য অন্নদার মাহাত্ম্যকীর্তন ততটা নয়, যতটা পৃষ্ঠপোষক রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বংশ গরিমাজ্ঞাপন এবং এই বংশের প্রতি দেবীর অপার কৃপার কাহিনীকীর্তন। অন্নদা যে উপলক্ষ, আশ্রয়প্রার্থী কবির কাছে আশ্রয়দাতা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভজনাই যে লক্ষ্য—*অন্নদামঙ্গল* কাব্যে 'বিদ্যাসুন্দর' খণ্ডের অন্তর্নিবেশ তার অকাট্য প্রমাণ। তবু কাহিনীর সূত্রধর অন্নদা। তাঁর কৃপায় ভবানন্দ মজুমদারের জন্ম, সৌভাগ্যলাভ ও বিবিধ সুখভোগান্তে ইহলীলা সংবরণ *অন্নদামঙ্গল* কাব্যকে একত্র বেঁধে রেখেছে এবং একে একটি আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তিনটি খণ্ডের মধ্যে এই যোগসূত্রটি না থাকলে সমগ্র *অন্নদামঙ্গল*-কে অনায়াসেই তিনটি পৃথক কাব্য হিসেবে গণ্য করা যেত। কবি তাঁর পরিকল্পনাকে রূপদান করার জন্য তাঁর কাব্যের তিনটি খণ্ডেই দেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপনকে লক্ষ্য হিসেবে পুরোবর্তী করে রেখেছেন। ফলে প্রথম খণ্ডে ভবানন্দের জন্মবৃত্তান্ত এবং তার প্রতি দেবীর অহৈতুকী কৃপা, দ্বিতীয়খণ্ডে ভবানন্দের সঙ্গে মহারাজা মানসিংহের সংযোগ ও ভবানন্দের ভাগ্যোদয় এবং তৃতীয় খণ্ডে ভবানন্দের দিল্লীর বাদশাহের নিকট গমন ও দেবীর অলৌকিক কৃপায় রাজমর্যাদা ও প্রতিষ্ঠালাভ বর্ণিত হয়েছে। এইভাবে প্রকাশিত হয়েছে অন্নদামহিমা। রক্ষিত হয়েছে দেবমহিমা কীর্তন-কেন্দ্রিক সাহিত্যের ঐতিহ্য সংরক্ষণের ধারা।

মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্য মূলত শক্তিকেন্দ্রিক। পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীদের মাহাত্ম্যকীর্তন করে সমগ্র মধ্যযুগ ধরে যে বিশেষ ধরনেব কাব্য রচিত হয়েছিল মঙ্গলকাব্য নামেই তার পরিচিতি। কাব্যের পরিকল্পনাগত বৈচিত্র্যের মধ্যেও কবিরা এই বক্তব্য রেখেছেন। গোষ্ঠী-পোষিত বিশেষ দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনেই কবিকুল ঐকান্তিক নিষ্ঠা দেখিয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে লৌকিক দেবতারাই প্রাধান্য পেয়ে এসেছেন, যাদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীদেবতা। বস্তুত অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যই উদাসীন শিবের প্রভাবের বিরুদ্ধে শক্তির প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। এই উদাসীন শিব চরিত্র নিঃসহায় এবং নিঃসম্বল। সামাজিক দিক থেকে সর্বনিম্নজাতি ও সামাজিক উৎপাদনের দিক থেকে সর্বনিম্নশ্রেণীর কৃষিদেবতা বলে তাঁর ওপর সমস্ত নিম্নপ্রবৃত্তি এবং নিন্দিত গুণগুলি আরোপিত হয়েছে। পৌরাণিক শিবের শান্ত সমাহিত আর্য মহিমা এখানে অন্তর্হিত। তার পরিবর্তে কর্মবিমুখতার দায়ে শিব ক্রমশই ব্রাত্য হয়ে উঠেছেন। আসলে "মানুষের মধ্যে জীবনকে ঘোষণা করার, প্রতিকূল পরিবেশের দুর্দৈব থেকে আত্মরক্ষা করার যে সহজ প্রবৃত্তি আছে তা নিজেকে প্রকাশ করতে চায়, কিন্তু নিষ্ক্রিয় জীবনদর্শন ও আরাধ্য দেবতা তার পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তখনি আঘাতের স্পর্শে সৃষ্ট নতুন ব্যক্তিসত্তার অন্তর্বিরোধ দেখা দেয় ; মানুষের নিজস্ব সত্তা যেন বিরোধী দুটো সত্তায় বিভক্ত হয়ে যায়—(১) তার পুরাতন ভাবাদর্শের প্রতি আকর্ষণ ; (২) সৃষ্টি চেতনায় উন্মুখ নতুন, এই দুয়ের সংঘাত থেকেই নতুন ব্যক্তিসত্তাব আবির্ভাব। এই সংঘাতে পরিবেশের সঙ্গে খ প না খাওয়া পুরাতন আদর্শ আপনাকে বাঁচাতে পারে না ; মধ্যযুগের ঝড়ঝঞ্ঝায় বিপর্যস্ত আবহাওয়ায় শিব তাই বেমানান।"

শক্তি দেবীর জনপ্রিয়তাও এই কারণে। শক্তি, যার ক্ষমতা কোন সীমায় ধরা যায় না।

ইচ্ছা অনিচ্ছা যার কোন নিয়ন্ত্রণ মানে না, যা সহজেই মানুষকে সর্বোচ্চ চূড়ায় ওঠাতে পারে আবার তেমনি ডোবাতে পারে অতল গহ্বরে। এমন এক শক্তির কল্পনা করেই এবং তার অপ্রতিহত প্রভাবের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে মানুষ তার পরিবেশের বিপর্যয় এবং আঘাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে, সেই পরিবেশকে জয় করার চেষ্টা করেছে। তুর্কি আক্রমণ এবং আক্রমণোত্তর পর্বের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অস্থিরতায় মানুষের জীবন হয়ে উঠেছিল অনিকেত। এই অবস্থা থেকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করার আকুতি প্রকাশিত হয়েছে মঙ্গল কাব্যগুলিতে। মঙ্গলকাব্যে শক্তিমাহাত্ম্য প্রচার লৌকিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত কারণ মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীরা লৌকিক দেবতা হিসেবেই পূজিত হতেন। অত্যন্ত বাস্তব এর ভাবাকাশ। রবীন্দ্রনাথ বললেন—"শক্তিকে দেবতা করিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে ভুলাইবার উপায় থাকে। শক্তিপূজক দুর্গতির মধ্যেও শক্তি অনুভব করিয়া ভীত হয়, উন্নতিতেও শক্তি অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। আমারই প্রতি বিশেষ অকৃপা ইহার ভয় যেমন আত্যন্তিক, আমারই প্রতি বিশেষ দয়া ইহার আনন্দও তেমনি অতিশয়। কিন্তু যে দেবতা বলেন ; সুখ-দুঃখ, দুর্গতি সদ্‌গতিও কিছুই নয়, ও কেবল মায়া, ওদিকে দৃকপাত করিও না, সংসারে তাহার উপাসক অল্পই অবশিষ্ট থাকে ; সংসার মুখে যাহাই বলুক, মুক্তি চায় না ধন জন-মান চায়।" শক্তি আধিপত্যের কারণ এটাই। বাংলার মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবের মূলেও আছে এই মানসিকতা। এর মুখ্য ধারা তিনটি—মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা'-ভাবনায় দেবীর চণ্ডিকা রূপের বিবর্তনে অন্নদার পরিণতি ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেন। তবে এই পর্যবসানের একটা ক্রম আছে। নদীর সঙ্গে এই চণ্ডীরূপের বিবর্তনের একটা তুলনা চলতে পারে। উৎসমুখ থেকে নির্গত নদী, পার্বত্য অঞ্চলের আকস্মিক নিম্নাভিমুখিতার কারণে প্রখর গতিবেগসম্পন্ন, ক্রোধান্ধ—কিন্তু পরবর্তীকালে জনপদ সংসর্গে ক্রমশ মসৃণ কোমল ও সরস। নদীর সঙ্গে তুলনায় আমরা বলতে পারি দেবী চণ্ডিকার প্রথম স্তরের নিদর্শন মানিক-মাধবের 'চণ্ডি' কাব্য, দ্বিতীয় স্তরে কবিকঙ্কণের *অভয়ামঙ্গল* আর শেষ স্তরে *অন্নদামঙ্গল*। বলা যায় পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণতা পেয়েছে ভারতচন্দ্রের কাব্যে, আর সেই কারণেই চণ্ডী নাম গ্রহণ করেছেন অন্নদা। দেবী কল্পনায়, কাহিনী পরিকল্পনায়, কাব্যের ভাব ভঙ্গি উদ্দেশ্য সবদিক থেকেই তখন তফাৎ ঘটে গেছে চণ্ডীমঙ্গল—অন্নদামঙ্গলে।

এইভাবে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে ঘটেছে মানবতার নবীন অভ্যুদয়। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে মূলত দেব-নির্ভর মানবতার-ই প্রকাশ দেখা যায়, দেবতার ওপর নির্ভর করে সেখানে মানবতার বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যেই সর্বপ্রথম দেখা গেল দেব-বিনির্ভর মানবতা। *অন্নদামঙ্গল*-এর প্রথম খণ্ডের অন্নপূর্ণা (এমনকি দ্বিতীয় খণ্ডের কালিকা দেবী) নামমাত্র দেবীর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। সহজচ্ছেদ্য দেবীত্বের আবরণে এঁদের ভিতর মানবতারই প্রকাশ ঘটেছে। ভগবৎ-শক্তির উর্ধ্বে মানবতার এই বিকাশের মধ্য দিয়েই সূচনা হয়েছে আধুনিক সাহিত্যের যুগাভিসার।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রধান সুর গোষ্ঠী-চেতনা। সমষ্টিগত ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষাই মধ্যযুগের কাব্যে বিকশিত হয়েছে, কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে সর্বপ্রথম দেখা গেল ব্যষ্টিচেতনা; সমষ্টি নয় ব্যক্তির উন্নতিই ভারতচন্দ্রের কাম্য। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জনে তাঁই তো তিনি তৎপর। এই একক ব্যক্তিত্বের বিকাশ আধুনিক সাহিত্যেরও প্রধান লক্ষণ। ভারতচন্দ্রের সমগ্র কাব্য-সাধনার মধ্য দিয়ে কবি-ব্যক্তিত্ব প্রধান হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

চণ্ডীদাসের কাব্যে কবি-ব্যক্তিত্ব নেই—বিদ্যাপতিতে আছে। তেমনি মুকুন্দরামে কবি-ব্যক্তিত্বের অভাব কিন্তু ভারতচন্দ্রে তার প্রাচুর্য। *অন্নদামঙ্গল* সচেতন মনের সৃষ্টি। এর প্রতিটি স্তবক এবং পংক্তির মধ্য দিয়ে কবির সৃষ্টি-সচেতনতা এবং কবি-ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কবিগুণাকরকে অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য সঙ্গীত রচনা করতে আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর সামনে ছিল কবি মুকুন্দের *অভয়ামঙ্গল*-এর আদর্শ-ভারতচন্দ্রে সেই আদর্শের রূপায়ণ ঘটেছে। শুধু বদলে গেছে যুগ, আর বদলে গেছে সেই যুগগত ব্যবধানকে স্বীকৃতি দিতে স্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গী। দুই যুগের কালগত ব্যবধান দ্বিশতাধিক, সংস্কার রুচি জীবনাদর্শের পরিবর্তন এক্ষেত্রে অনিবার্য। একদিকে কবি মুকুন্দের যুগ অনিঃশেষ দৈবনির্ভরতার যুগ; আত্মবিশ্বাস তখন দেবাশ্রয়ের প্রার্থনার মধ্যে হারিয়ে গেছে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে দৈবী অনুগ্রহের অপেক্ষা। অন্যদিকে ভারতচন্দ্রের যুগ, ধর্মশৈথিল্যের যুগ। আঘাতে বেদনায় নিষ্পেষিত হতে হতে মানুষের মধ্যে দেব আনুগত্যের চিহ্ন ক্রমশ শিথিল হয়ে যাচ্ছে। কবি মুকুন্দের চণ্ডিকা-আরাধনা জীবনের দায়ে, অস্তিত্বের দায়ে। চণ্ডী তখন লোকজীবনের সর্বসংস্কারের মূলে। সর্বভয়নাশিনী, সর্বসুখদাত্রী, বিপদবারণী মহামায়া, আর ভারতচন্দ্রের কাব্যে অন্নদা আরাধনা, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহ ছায়ায় আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে। সুতরাং সর্ব থেকে একক, লোকজীবন থেকে ব্যক্তিজীবন, গণ থেকে আত্মিক কামনা-বাসনা সিদ্ধির সংকেত ভারতচন্দ্রের কবিমানসকে অগ্রজের আদর্শ থেকে ভিন্নমুখী করল। নিঃসন্দেহে দুজন কবিই সমকালের প্রতিনিধি। সমসাময়িক জীবনের নিপুণ ভাষ্যকার। তবু প্রথমজন রাজার আদেশ শিরোধার্য করেও গণসভার কবি হয়ে রইলেন। ষোড়শ শতকের সোনাঝরা সময়ের হয়েও লুকিয়ে থাকা সহজ অনাড়ম্বর দুঃখী জীবনের কথক হিসেবেই তিনি সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান করে নিলেন। অপরজন রাজসভার কবি, আত্মমনস্ক। আর সে-কারণেই অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্ভাগ্যের দ্রষ্টা হয়েও রাজসভাকাব্যের শর্তপূরণকারী।

তাই *অন্নদামঙ্গল*-এ ধর্ম আছে। কিন্তু ধর্মের বন্ধন শিথিল। মানবজীবনের আবেগ আকাঙ্ক্ষা ধর্মের আবরণ ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই জীবন কথাতে উঠে এসেছে তাঁর যুগের রস ও রুচি। রাজা এবং রাজার সভাসদ্‌দের আনন্দবিধানের জন্য রচিত এই কাব্যে ভোগবিলাস, অশ্লীলতা যেমন এসেছে ; তেমনি রয়েছে নাগরিক বৈদগ্ধ্য আর লিপিচাতুর্য। তথাকথিত অশ্লীলতাকে এই বৈদগ্ধ্যের নির্মোকে ঢেকে রেখেছেন কবি। 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাষ'—কবির এই উক্তিতে যুগের প্রতিধ্বনি আছে। কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে ব্যবসায় অর্থনীতির গৌরবকীর্তন উদীয়মান বণিক শক্তির ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠেছে। এই কারণেই তিনি যুগসন্ধির কবি—তাঁর মঙ্গলকাব্য 'নূতন মঙ্গল'।